আত্মহত্যা নয়, চাই জীবনের উৎসব

এস এম আবুল কালাম আজাদ

নিজেকে হত্যার অপর নাম আত্মহত্যা। সুস্থ্য, সুন্দর জীবন সবারই কাম্য। ভবিষ্যৎ নিয়ে রঙ্গিন স্বপ্ন দেখে সবাই। তবুও পৃথিবী থেকে নিজেকে চিরকালের জন্য সরিয়ে দিতে চায় কেন মানুষ? বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রকাশিত প্রতিবেদন (২০১৪) অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী আত্মহত্যার হার প্রতি লাখে ১১.৪ জন, উন্নত দেশগুলোতে নারীর তুলনায় পুরুষ ৩ গুণ বেশি আত্মহত্যা করে, আর বাংলাদেশে আত্মহত্যাকারীদের ৬০ ভাগই নারী। অধিকাংশ দেশে যেখানে ৭০ বছরের অধিক বয়সী নারী-পুরুষের মধ্যে আত্মহত্যার হার বেশি সেখানে আমাদের দেশে ১৫-২৯ বছর বয়সীদের মধ্যে এই হার বেশি এবং এই বয়সে মৃত্যুর দ্বিতীয় প্রধান কারণ হচ্ছে আত্মহত্যা। অনাকাঙ্ক্ষিত এই আত্মহত্যা তথা মৃত্যুর কারণে অগণিত পরিবার আজ বিপর্যস্ত, সামাজিক জীবনে বিরাজ করছে অস্থিরতা ও নিরাপত্তাহীনতা, সুশীল সমাজ ব্যথিত, চিন্তিত। সামগ্রিভাবে পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। আত্মহত্যার কারণসমূহ প্রধানত সামাজিক, পারিবারিক, ব্যক্তিগত ও মানসিক।

আত্মহত্যার সামাজিক কারণসমূহ

সমাজে বখাটেদের অত্যাচার, যৌন হয়রানি, ইভটিজিং মাত্রাতিরিক্তভাবে বেড়ে গেছে। ইভটিজিং-কে হালকাভাবে নেয়া উচিত নয়। বখাটেরা নারীদের দুর্বলতার সুযোগ নেয়, যে কোন ভয়ংকর ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড ঘটাতে পিছপা হয় না। এদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে চরম হতাশা ও অসহায়ত্ববোধ থেকে কিশোরী, নারী, শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়। বখাটেরা অন্যান্য সামাজিক অপরাধের সাথেও জড়িত -- বিশেষ করে মাদকসেবন ও মাদকব্যবসা। এই বিপথগামী ছেলে-যুবকদের পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক আশ্রয়-প্রশ্রয় না দিয়ে আইনানুগ ও সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার । বয়ঃসন্ধিকালে বা কিশোর বয়সে ছেলেদের মধ্যে সমাজ-বিরোধী আচরণ (কনডাক্ট ডিসঅর্ডার), যেমন চুরি করা, মিথ্যা কথা বলা, বাড়ির বাইরে থাকা, নেশা করা ইত্যাদি, প্রবণতা বাড়তে থাকে। অভিভাবকদের খেয়াল রাখতে হবে অল্প বয়সী ছেলেদের মধ্যে এ ধরনের সমাজ-বিরোধী আচরণ (এন্টি-সোসাল পারসোনালিটি) বা মাদকাসক্তি দেখা দিলে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট বা সাইকিয়াট্রিস্ট-এর মতো দক্ষ পেশাজীবিদের সহায়তা নিতে হবে। সমস্যাগুলো ক্রনিক বা তীব্র হয়ে গেলে দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সেবার প্রয়োজন হতে পারে।

প্রযুক্তির অপব্যবহার

মোবাইল, ল্যাপটপ, কম্পিউটার, ইন্টারনেট ইত্যাদি পণ্যের সহজলভ্যতার কারণে এসব প্রযুক্তির অপব্যবহার হচ্ছে। যেমন পর্নোগ্রাফি, ইন্টারনেটে গোপন প্রেম বা নগ্ন ভিডিও প্রকাশের কারণে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটছে। এছাড়া বিভিন্ন বয়সী ছেলে-মেয়েদের ইন্টারনেট ব্যবহার একধরনের আসক্তিতে পরিণত হয়েছে। এরা ঘন্টার পর ঘন্টা ইন্টারনেটে সময় কাটায়, অথচ সৃস্টিশীল কর্মকাণ্ড যেমন আর্ট, নাচ, গান, বিজ্ঞান, ধর্মীয় শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে আগ্রহ নেই। বিয়েবহির্ভূত যৌনতা বিষয়ে ধর্মীয়, পারিবারিক এবং সামাজিক সংস্কার কমে যাচ্ছে। তরুণ-তরুণীদের ভালোবাসা-ভালোলাগা দ্রুত শারীরিক সম্পর্কের পর্যায়ে গড় াচ্ছে। অবাধ মেলামেশা থেকে সৃষ্ট জটিলতার কারণে সংঘটিত হচ্ছে নানা ধরনের অপরাধ এবং অনেক সময় তা গড়াচ্ছে আত্মহত্যা পর্যন্ত। বাবা-মা, শিক্ষকরা শুধু সন্তানের পরীক্ষার রেজাল্ট নিয়ে চিন্তিত থাকেন, নৈতিক মূল্যবোধ, পারিবারিক-সামাজিক দায়িত্ববোধ, দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে ছেলে-মেয়েদের সমৃদ্ধ করার দিকে সময় দিতে ভুলে যান। ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পরিপূর্ণ বিকাশ হচ্ছে না।

আত্মহত্যার পারিবারিক কারণসমূহ

পরিবারের অমতে বিয়ে, যৌতুকের কারণে স্বামী ও স্বামীর পরিবারের অত্যাচার, পারিবারিক কলহ, প্রেমে ব্যর্থতা বা প্রতারণা, নিজের অমতে জোর করে বিয়ে দেয়া, পরকীয়া, পরীক্ষায় ফেল ইত্যাদি কারণে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটছে। কাজেই বোঝা যাচ্ছে পারিবারিক বিভিন্ন সমস্যার সমাধান, দ্বন্দ্ব-সঙ্কট নিরসন বা সঠিকভাবে মোকাবেলা বা খাপ খাওয়াতে ব্যর্থতার ফলে আত্মহত্যার করুণ পরিণতি দেখতে হচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে পেশাজীবিদের সাহায্য নিয়ে সঙ্কট মোকাবেলা করে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়ানো যায়।

আত্মহত্যার আবেগীয়/মানসিক কারণসমূহ

সাইকোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার, যেমন বিষণ্নতা বা সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তি যথাযথ স্বাস্থ্যসেবার অভাবে অসহনীয় মানসিক যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেতে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে পারেন। এছাড়া ব্যক্তির দৃষ্টিতে অসমাধানযোগ্য সমস্যার চাপ, অসহায়ত্ব-হতাশা, বঞ্চনা, ক্ষোভ ইত্যাদি মানসিক চাপ (স্ট্রেস) আত্মহত্যার ঝুঁকি বাড়ায়।

আত্মহত্যারোধে সাইকোলজিক্যাল ম্যানেজমেন্ট

আত্মহত্যা সম্পর্কে আমাদের মধ্যে কিছু প্রচলিত ধারণা আছে; যেমন, আত্মহত্যা নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করলে ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তি আরো উৎসাহিত হয়, শুধু জেদি, পাগলাটে বা মানসিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তি আত্মহত্যার সাহস দেখায়। প্রকৃতপক্ষে ঝুঁকিতে থাকা যে কেউ আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে পারে। আত্মহত্যাপ্রবণ ব্যক্তি কতগুলো পূর্বাভাস বা সংকেত (আর্লি ওয়ার্নিং সাইন) প্রদান করে; যেমন, মরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করা, অনশন করা, নিজেকে আঘাত করা, হঠাৎ করে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন, অনিদ্রা, অরুচি, প্রচণ্ড হতাশা, পাপবোধ ইত্যাদি। এক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যরা ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার মাধ্যমে আত্মহত্যাপ্রবণতা থেকে বের করে আনতে পারেন। সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে, কারণ ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তি একাধিকবার আত্মহত্যার চেষ্টা করতে পারে।

তবে ঝুঁকির মাত্রা বেশি হলে বা আত্মহত্যাপ্রবণ ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হলে, স্বাস্থ্য পেশাজীবিদের (ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট, ডাক্তার, হাসপাতালের ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার) সহায়তা নেওয়া জরুরি।

চেয়ারম্যান ও সহযোগী অধ্যাপক
ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়